Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 23090120636

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার

রোলঃ 23090120636

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার, আইডিঃ 23090120636 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া আক্তার

আইডিঃ 23090120636

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান.....5

ভুমিকা : 5

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন : 5

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : 6

নারী শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনাঃ.....24

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা:.....27

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা : 35

সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা:.....40

তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা : 42

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা:.....45

দ্বীন শিক্ষা না করার ক্ষতি:.....60

শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা : 61

নারী শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমুহ:.....62

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পদক্ষেপ : 64

দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পন্থা ও করণীয়:.....65

উপসংহার:.....66

নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান

ভুমিকা :

মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ইসলাম নারী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ করে দিয়ে ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রাক-ইসলামিক যুগে যখন নারীরা অবহেলিত ছিল, তখন ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি, বরং তাদের সমান অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানবজাতিকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করা এবং এই ইবাদাতের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অপরিহার্য।

এই থিসিসের মাধ্যমে ইসলামে নারী শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব ও এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হবে। নবীজি (সা.) কীভাবে নারী শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবীগণ কীভাবে জ্ঞান চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার উপর আলোকপাত করা হবে। এছাড়া, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তা তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ভিত্তি থেকে বর্তমানে নারী শিক্ষায় ইসলামি নীতি বাস্তবায়নে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন :

পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক একটা সম্পদ। আর এ সম্পদের মধ্য হতে সেরা সম্পদ হলো— নারী। রাসূলে কারিম (সাঃ) ইরশাদ করেন —

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

অর্থাৎ—দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো পূর্ণশিলা নারী।(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং—১৪৬৭)

যে জিনিস যত বেশি মূল্যবান, তা রাখতে হয় ততটা সযত্নে ও সংগোপনে এবং তার ব্যবহারও করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। মূল্যবান সম্পদকে কেউ অবমূল্যায়ন করে এখানে—সেখানে যেভাবে ফেলে রাখে না, যে কারো সামনে প্রকাশ করে না, যেন— তেনভাবে অবহেলা করে এটাকে ব্যবহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ

নারীকেও বেপর্দাভাবে বাইরে বের হওয়া, যথেচ্ছায় এদিক সেদিক যাওয়া, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, যার তার সাথে দেখা—সাক্ষাৎ করা সবগুলোই তার অবমূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ। মূল্যবান সম্পদ যেভাবে সংরক্ষণে অবহেলা হলে অথবা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ঘটে অনিষ্টতা, ঠিক তেমনিভাবে নারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মূল্যবান জিনিসের মতো অতি মূল্যবান নারীকেও থাকতে হবে তার নির্দিষ্ট বলয়ে। হীরা, মুক্তাকে মানুষ কখনো যত্রতত্র ফেলে রাখে না, কোন ব্যক্তি যদি হীরা—মুক্তার মতো মূল্যবান জিনিসকে যত্রতত্র ফেলে রাখে তাকে কেউ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বলে না, বরং সকলের দৃষ্টিতে সে প্রমাণিত হবে নির্বোধ হিসেবে। নারী হীরা—মুক্তার চেয়েও বহুগুণ দামী। সুতরাং স্বাধীনতা, আধুনিকতা বা অধিকারের নামে তাকে যত্রতত্র ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ।
সুতরাং নারীর জন্য যেভাবে শিক্ষা জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা দানের পরিবেশ ও পদ্ধতিও হতে হবে শরীয়ত সম্মত, নববী মানহাজ অনুযায়ী। শিক্ষার কারিকুলাম হতে হবে এমন যেখানে একজন নারী বাস্তবিক অর্থে'ই পরিণত হবে পৃথিবীর সেরা সম্পদে।
তার শিক্ষার ভিত্তি হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক এমন এক মানহাজ, যাতে সে মন থেকেই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারি হবে, তার জবান হবে সংযত, সে হবে শরয়ী পর্দায় অভ্যস্ত, স্বামীর অনুগত, হবে সন্তান লালন—পালনে আন্তরিক, রান্না—বান্নাসহ ঘরোয়া কাজকর্মে সুদক্ষ এবং সন্তান প্রতিপালনসহ তার এবাদত বন্দেগিগুলোর শরযী বিধান সম্পর্কে সে হবে পূর্ণ জ্ঞাত।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।[1]

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে[2], চিন্তা-গবেষণা করতে[3], অনুধাবন করতে[4], এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে প্রথম যে ওহী

নাযিল তার প্রথম শব্দ ছিল ‘ইকরা’ অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকা। এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।

ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবে‘য়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নি। উভয়ের অধিকার সমান।[5]

ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত, নারীগণও তদ্রূপ করত। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হত এবং সেই সময়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ, বিশেষ করে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর নিকট হতে বড় বড় সাহাবী ও তাবে‘য়ীগণ হাদীস তাফসীর ও ফিকহ্ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু

তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থায়ই
সে শরী'আতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।[6]

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমদের তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।"[7]
এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোটা মানব জাতিকে ধবংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনো রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূঁড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীত দাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনি শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ,

উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্নার মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।[৪]

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরী মনে করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তা‘লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।’’[৯]

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ‘‘আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।’’[১০]

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ‘ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি মহিলাদের জন্যও ‘ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে'য়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের 'ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।'' এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ''এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।'' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট 'ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 'ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। ''মাদখাল'' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা

দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ "এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।" সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরী'আতের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।[11]

রেফারেন্সসমুহ :

[1] ফাতেমা আলী, ইসলামে নারী, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫-৪১।
[2] সূরা 'আলাক : ১।
[3] সূরা সোয়াদ : ২৯।
[4] সূরা বাকারাহ্ : ১৬৪।
[5] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৬।
[6] সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, পর্দা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।
[7] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৪।
[8] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরিদাবাদী, নবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১'।
[9] বুখারী, হাদীস নং ৯৭।
[10] মাওলানা নো'মান আহমদ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ঢাকাঃ শিবলী প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃ. ৯৪।
[11] .মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী, উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব, ঢাকাঃ আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৩৪-৩৬।

- ***জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান - ১:***

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[1] তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল' নামক

গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[3] বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন।[4] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন।[5] তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, "আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।"[6]

অপর একজন আয়েশা যিনি সা'দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[7]

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।"[8]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[9] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের[10] পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[11]

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।[12]

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[13]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন[14]। আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।[15]

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।[16]

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা,

উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, করীমা বিনতে আল্‌-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।[17]

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মূল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।[18]

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।[19]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে

পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ

করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো।[20] সাহাবী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন, ‘‘আমি উম্মূল মু’মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।[21]

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সাথে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[22]

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

''প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে লোক আসতো।''[23]

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[24]

আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائسة إلا وجدنا عندها منه علما.

''আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।''[25]

রেফারেন্সসমুহ:

[1] উম্মূল মু'মিনীন, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্থকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক

হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। (মুফতী আমিমূল ইহসান, আসমাউর রিজাল, (ঢাকা, আল বারাকা লাইব্রেরী, ১৯৮৩), পৃ. ২২-২৩।

[2] মুফতী আমিমূল ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[3] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আছ, কিতাবুত তিবিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

[4] বালাযুরী, ফতুহুল বুলদান, (কায়রো, ১ম সংস্কার, তা. বি.), পৃ. ৪৭২।

[5] আল্লামা শিবলী, সিরাতুন্নবী, (উর্দূ টেক্সট), (আলী গড়, ২য় খণ্ড, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৪০৯।

[6] ইমাম মহিউদ্দীন আন্-নববী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৪।

[7] Tuta Khalil, The contribution of the Arabs to education, (New York, 1926), P. 79.

[8] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

[9] ফজলুর রহমান খান, ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ, (ঢাকা , ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ৮১।

[10] নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ৬৩ বছর বয়সে ১১ হিজরীতে ১২ রবিউল আউয়াল, মুতাবিক ৮ই জুন, ৬৩২ খ্রীঃ সোমবার দ্বিপ্রহরে মসজিদে নববীর হুজরায় উম্মূল মু'মিননীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট গৃহে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, (ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লি., ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৬।

[11] ডা. মোঃ আযহার আলী, শিক্ষার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১।

[12] ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

[13] ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

[14] মুফতী আমিমূল আহসান, তারিখু ইলমিল হাদীস, (ঢাকা, মুফতি মঞ্জিল, তা. বি.), পৃ. ২১।

[15] ইবনে কাইয়ুম জাওজিয়া, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

[16] ইবনে হাজার আস কালানী, ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

[17] আবুল হাসান আল্-বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, (কায়রো, বৈরূত, দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

[18] ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

[19] .আবু আব্দুল্লাহ্ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।

[20] .ফজলুর রহমান খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫।

[21] .মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

[22] ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওজিয়া, ইলামূল মুয়াককিয়ীন, ১ম খণ্ড, কুর্দঃ মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হিঃ, পৃ. ৯-১১।

[23] বুখারী, আল্-আদাবুল মুফরাদ, বৈরুতঃ দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ্, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮২।

[24] ইবনু ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[25] তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, আবওয়াবুল মানাকিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

- ***জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান - ২***

মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী লিখেছেন, ''যাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু'জনও তাদের শামিল। তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না, বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন।''[26]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ''আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।''[27]

হাফিয ইবনে হাজার (র.) অন্য এক স্থানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি'য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[28]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, ''যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।''[29]

ইমাম যুহরী (র.) অন্যত্র বলেছেন, ''আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।''[30]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা হলো, ''অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় আয়েশা

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর ভিন্ন মতসমূহ।’’ কিতাবের নাম দিয়েছেন- ‘‘আল্-ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তদরাকাৎহু আয়িশা ‘আলাস্ সাহাবাহ্’’। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা

সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

উমর ইবনু খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

‘আল্-ইজাবাহ্’ কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল্-আফগানী বলেছেন, ‘‘আমি কয়েক বছর যাবত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে দস্তুরমত হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করে নি।’’[31]

উম্মূল মু‘মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।[32]

উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম বর্ণনা করার পর হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেনঃ এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি'ঈ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন।[33]

মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেনঃ

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পত্নীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেমন করে? তাই তিনি লোক মারফত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সামাধান করে দেন।[34]

সাহাবীগণের 'ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেনঃ

''সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।''[35]

রুবাই' বিনতে মু'আওয়ায রাদিয়াল্লাহু 'আনহা একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[36] রুবাই' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে', উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।[37]

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শা'বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি'ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) লিখেছেন, ‘‘তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি‘য়ী আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।’’[38]
সা‘আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[39]ইমাম শাফে‘য়ী (র.) হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা (র.)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[40]

রেফারেন্সসমুহ:

[26] ইবনে ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[27] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[28] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

[29] ইবন আব্দিল বার, আল্-ইসতিয়াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; নিয়াম ফতেহপুরী, আস্-সাহাবীয়াত, অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মহিলা সাহাবী, ঢাকাঃ আল্-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৬৩।

[30] ইবনে সা‘দ, আত্-তাবাকাত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মাওলানা সাঈদ আনসারী ও মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, হায়াতুস সাহাবীয়াত, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ, ঢাকাঃ নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, চকবাজার, তা. বি. পৃ. ৪৮।

[31] আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ্, তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ্, ১ম খণ্ড, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল মুনয়েম, আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মাওলানা মুনাওয়ার হোসাইন, ঢাকাঃ

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৩।

[32] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

[33] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।

[34] আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; ইবন জারীর আত্-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মূলুক, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; ইবনে হিসাম ,আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

[35] ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, রিয়াদঃ দারুস্ সালাম, তা. বি., পৃ. ২২১।

[36] ইবনু আব্দুল বার, আল্-ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাতু রুবাই' বিনতে মু'আওয়ায, ৪র্থ খণ্ড,, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩৭।

[37] ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ. ৪৫২।

[38] ইবনু আব্দিল বার, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪৭।

[39] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[40] ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, মিশর: আল্-মাতবা'আতুল আমিরিয়্যাহ্, ১২৮৩ হি., পৃ. ১২৯।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনাঃ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেসব গুণের জন্য ইসলাম পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হিসেবে পরিচিত, সমতা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা অত্যন্ত জোরের সাথে ব্যক্ত করেছে।[30] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤﴾ [النساء: ١٢٤]

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"[31] পরকালে জান্নাতের চির শান্তি লাভের উপায় হিসেবে দুনিয়াতে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে দ্বীন। সুতরাং ইলমে দ্বীন জানা প্রত্যেক নর নারীর উপর একান্ত জরুরী।[32] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩﴾ [الزمر: ٩]

"বল! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[33]

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।"[34]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি শুধু জ্ঞানার্জনের তাকীদই দেননি, জ্ঞানার্জনের মর্যাদার বিষয়টিও আল্-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ﴾ [المجادلة: ١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।"[35]

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।"[36]

এ উক্তিটি ভেবে দেখার মত। কেননা জ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও ধৈর্যের ফলে দ্বীনী জ্ঞান বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়ে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট পৌঁছায়।[37]

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে।[38] আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।[39]

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم : ٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।”[40]

এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

“তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।”[41]

শেষকথা:

ইমাম ধাহাবী উল্লেখ করেছেন যে জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোনো মহিলা বর্ণনাকারী নেই। নারীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সততা এবং স্বাধীনতা ছিল অনবদ্য। সবচেয়ে অসামান্য ছিল তাদের বৌদ্ধিক কৃতিত্বের উচ্চ গুণমান এবং এর জন্য তারা যে সম্মান পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, একজন অভিমানী পুরুষের এই তথ্যগুলি স্বীকার করতে সমস্যা হবে। আজকাল মহিলারা হাদিস শিক্ষা এবং ফতোয়া জারি করার ক্ষেত্রে এত কম অংশ নেয় যে একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যে তারা কখনও এই ভূমিকা পালন করেনি। উপরের

আলোচনাটি দেখায় যে নারী পণ্ডিতরা মহানবী (সাঃ) এর সময় থেকে ইসলামী শিক্ষার বিকাশে সত্যিকার অর্থে বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন। কিছু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ নারীদের পণ্ডিত জনসমাবেশে অংশগ্রহণ এবং সহজে জ্ঞান অর্জনে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের আইন পাল্টে দিয়েছে। প্রজন্মের সুবিধার জন্য সমাজে নারীদের অবদান প্রচার করা প্রয়োজন।

রেফারেন্সসমুহ:

[30] .ড. মোঃ আজহার আলী, *শিক্ষার ইতিহাস,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২১১।

[31] সূরা আন্-নিসা : ১২৪।

[32] প্রিন্সিপাল মাওলানা আকবর, বেগম নূরজাহান, *বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন,* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮), পৃ. ৬।

[33] সূরা আয্-যুমার : ৯।

[34] মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, *ইবনু মাজাহ্,* কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২২৪।

[35] .সূরা মুজাদালাহ্ : ১১।

[36] .ইমাম মহিউদ্দীন আন্-নববী, কিতাবুল ইলম্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

[37] .ফযিলা তাহের, *মেয়েদের ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা,* মাসিক দারুস সালাম, ঢাকা, দারুস সালাম, ডিসেম্বর জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ১২।

[38] .'সুদূর কোন দেশে গিয়ে হলেও বিদ্যা অর্জনের তাকীদ' সংক্রান্ত বিষয়টির দলিল হিসেবে বলা হয়, "সুদূর চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞানান্বেষণ কর" থেকে। এ কথা হাদীস হিসাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি আদৌ হাদীস কি-না, হাদীস বিশারদগণ যুগ যুগ ধরে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ এর সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বা'য়ীফাহ, প্রথম খন্ডে ৪১৩ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'হাদীসটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। নবী কারীম (সাঃ)-এ কথা বলেননি।'

[39] প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আকবর, বেগম নূরজাহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

[40] .আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাহরীম : ৬।

[41] .আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর,* ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা:

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে।" আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে "তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর।" এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البقرة : ٤٣]

"তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[13]
এখানে ব্যবহৃত দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

রেফারেন্সসমুহ:

[13] সূরা আল বাকারাহ :৪৩।

- ***মধ্যযুগে মুসলিম নারীদের ইসলামী শিক্ষায় অবদান :***

ইসলাম শিক্ষাকে অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে বেশি জোর দেয় এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য ছাড়াই একে প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য অধিকার বলে মনে করে। একটি সমাজের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষা পুরুষদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব অবাক হয়ে দেখে যে অনেক মুসলিম নারী পণ্ডিত আছেন, যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও এখানে হাদিস বিজ্ঞানে নারী পণ্ডিতদের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে, অধ্যয়নগুলি দেখায় যে নারীরাও ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, সাহিত্য, প্রযুক্তি, ক্যালিগ্রাফি, চিকিৎসা এবং অনেক কারুশিল্পের মতো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছেন যেগুলিকে

আমরা ইসলামিক বলে স্বীকৃতি দিই এবং প্রশংসা করি। নীচে ইসলামী যুগে মহিলা মুসলিম পণ্ডিতদের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) প্রারম্ভিক ইসলামী যুগ:

ইসলামের আদিকাল থেকে, মহিলারা হাদীস সংরক্ষণ ও চাষাবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা মসজিদে নববীতে নামাজ ও খুতবা দিতেন এবং জনসমাবেশে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তার মৃত্যুর পর, সাহাবাগণ উম্মহাতুল মুমিনীনের কাছে যেতেন যারা তাদের জ্ঞান দিয়ে তাদের পথ দেখাতে কখনও লজ্জাবোধ করেননি। এ ব্যাপারে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, মায়মুনাহ, উম্মে সালামাহ এবং সাফিয়া বিনতে হুয়ায়-এর নাম প্রসিদ্ধ (আল্লাহ তাদের সকলের সাথে খুশি, আমীন)। হাদিসের প্রধান বর্ণনাকারী হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে আয়েশা রা.এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তিনি আনসারী মহিলাদের প্রশংসা করেন যে উম্মাহর উপকার করে এমন মহিলাদের সম্পর্কিত সমস্যাগুলি জিজ্ঞাসা করার জন্য উন্মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য মহিলা সাহাবীরাও ইতিহাসে তাদের চিহ্ন রেখে গেছেন। উত্তরসূরিদের মধ্যে, নারীরা মুসলিম সভ্যতায় গতিশীল অবদান রেখেছেন। উম্ম-উদ-দারদা সুগরাহ (মৃত্যু: 81/700 CE) ছিলেন একজন তাবাইয়া (যিনি ছিলেন মুসলিম অনুসারী এবং সাহাবার সমসাময়িক এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) এবং 7 ম শতাব্দীর দামেস্কের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ যাকে বলে মনে করা হয়। ইবনে সিরীন এবং হাসান আল-বাসারীর মতো বিশিষ্ট হাদীস বিশারদদের থেকেও উচ্চতর। তিনি খলিফা আবদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের ফিকাহ শিক্ষক ছিলেন।

হাফসাহ বিনতে-সিরীন সাহাবী আনাস ইবনে মালিকের কাছ থেকে অনেক হাদীস শিখেছিলেন এবং তাফসীর ও কুরআন তেলাওয়াতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবিদা আল-মাদানিয়াহ (অষ্টম শতাব্দীর পণ্ডিত) ছিলেন একজন মুক্তকৃত দাস এবং স্প্যানিশ হাদীস পণ্ডিত হাবিব দুহানের স্ত্রী। তিনি মদীনার মহান হাদীস বিশারদদের কাছ থেকে হাদীস মুখস্থ করে এবং তার শিক্ষকদের কর্তৃত্বে দশ হাজারেরও বেশি হাদীস বর্ণনা করে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন।

ফাতিমা আল-বাতায়াহিয়াহ 8ম শতাব্দীর একজন সুপরিচিত পন্ডিত ছিলেন এবং দামেস্কে সহীহ বুখারী পড়াতেন। তার বক্তৃতায় অংশ নিতে সে সময়ের নেতৃস্থানীয় পুরুষ আলেমরা দূরদূরান্ত থেকে আসতেন।

বিখ্যাত সাহাবির কন্যা আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াকাস এতই জ্ঞানী ছিলেন যে ইমাম মালিক, হাকিম ইবনে উতায়বা এবং আইয়ুব সাখতিয়ানি ছিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে।

(২) দশম-দ্বাদশ শতকে:

ইতিহাস সাক্ষী আছে যে অনেক ব্যতিক্রমী মহিলা যারা সমাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে এটি সংস্কার করেছিলেন। জয়নাব বিনতে কামাল, দ্বাদশ শতাব্দীর একজন পণ্ডিত, হাদিসের 400 টিরও বেশি বই পড়ান। তার পাঠ্যের "উটের বোঝা" অসংখ্য ছাত্রকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক খ্যাতির সাথে, তার লিঙ্গ দামেস্কের উল্লেখযোগ্য একাডেমিক ইনস্টিটিউটে তার শিক্ষাদানে কোন বাধা ছিল না।

ফখর আন-নিসা উম্মে মুহাম্মাদ শুহদাহ আল-বাগদাদিয়াহ ছিলেন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আবু নসর আহমদ ইবনে আল-ফারাজ আল-দিনাওয়ারির (মৃত্যু 574 হি) কন্যা। তিনি আব্বাসীয় যুগে ঐতিহ্যবাদীদের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হাদীসে বাগ্মী এবং ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শী ছিলেন।

একইভাবে, উম্মুল কিরাম কারিমা বিনতে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম আল-মারওয়াযিয়াহ (মৃত্যু ৪৬৫ হি.) ছিলেন সহীহ বুখারীর একজন বিখ্যাত বর্ণনাকারী। তিনি কাউকে তার কাছ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দেবেন না যদি না তারা তার আসল কপির সাথে তুলনা করেন। হুমায়দাহ বিনতে মুহাম্মদ শরীফ ইবনে শামস আদ-দ্বীন আল-আসবাহানিয়্যাহ (মৃত্যু 1087) তার হাদিস লেখার জন্য পরিচিত ছিলেন যার মধ্যে শায়খ আল-তুসির আল-ইস্তিবসারের উপর তার প্রান্তিক নোট রয়েছে যা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। তিনি

হাদিস বর্ণনাকারীদের উপর রিজাল হুমায়দাহ নামে একটি বইও সংকলন করেন।

(৩) ত্রিয়াদশ থেকে পরের শতক :

এই সময়কে হাদীসের পুনরুজ্জীবনের সময় বলে মনে করা হয়। ফাতিমা বিনতে আল-জুজদানিয়াহ (মৃত্যু 524) ছিলেন ইসফাহানের একজন অসামান্য হাদীস বিশারদ। দামেস্কের জয়নাব বিনতে উমর আল-কিন্দিও ছিলেন 13শ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইজাজ অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে হাদীস। তিনি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুওয়াত্তা মালিক, আল-

তিরমিযীর শামাইল এবং আল-তাহাভীর শরাহ মা'আনি আল-আতহারের মতো বই পড়াতেন। বিখ্যাত উত্তর আফ্রিকার পর্যটক ইবনে-বতুতা (মৃত্যু 1369), তাজুল-দিন আল-সুবকি (মৃত্যু 1355) এবং আদ-ধাহাবি (মৃত্যু 1348) তার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। ইবনে হাজার আল-আসকালানির (মৃত্যু 1448) অসংখ্য ইসনাদে তার নাম পাওয়া যায়।
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে উম্মে সালামাহ আস-সালাফিয়াহ, ইয়েমেনের একজন স্থানীয় পণ্ডিত। তিনি শায়খ মুকবিল ইবনে হাদির স্ত্রী, একজন প্রয়াত ইয়েমেনি আলেম এবং দাম্মাজের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আত-তিহফাত আস-সুন্নিয়া, আল-মুতামামা, আল-বাইত আল-হাদিস, আল-কওলুল-মুফিদ ইত্যাদি থেকে মুখস্থ ও ব্যাখ্যা অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। আল-আদাব আল-মুফরাদে তার কাজ বর্ণনার শৃঙ্খলে বর্ণনাকারীদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি হাদীসের ফিকহ এবং সূত্রের প্রমাণীকরণ থেকে উপকারী পয়েন্টগুলিও তুলে ধরেন। তার মেয়ে আয়েশা বিনতে মুকবিল, আল-ওয়াদিইয়াহ একজন শক্তিশালী গবেষক যিনি ইবনে হাজারের বুলগ আল-মারামের উপর মূল্যবান ভাষ্য দিয়েছেন।

দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। "মাদখাল" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ "এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।" সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরী'আতের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।[11]

রেফারেন্সসমুহ:

[1] ফাতেমা আলী, ইসলামে নারী, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫-৪১।
[2] সূরা 'আলাক : ১।

[3] সূরা সোয়াদ : ২৯।
[4] সূরা বাকারাহ্ : ১৬৪।
[5] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৬।
[6] সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, পর্দা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।
[7] মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৪।
[8] মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরিদাবাদী, নবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১'।
[9] বুখারী, হাদীস নং ৯৭।
[10] মাওলানা নো'মান আহমদ, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, ঢাকাঃ শিবলী প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃ. ৯৪।
[11] .মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী, উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব, ঢাকাঃ আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৩৪-৩৬।

- ***নারীশিক্ষা নিয়ে নবীজির ভাবনা:***

মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসের কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন, তা ভাস্বর হয়ে থাকবে মহাকাল। তিনি নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছেন, তা অতীত ও বর্তমানের কোনো ব্যক্তি, আইন, জীবনপদ্ধতি দান করতে পারেনি।

জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে নারী-পুরুষের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক (নর-নারী) মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।

' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪)

উক্ত হাদিসে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার দুই আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন, যা আমাকে আরশের নিচের ভাণ্ডার থেকে প্রদান করা হয়েছে।

অতএব, এগুলো তোমরা নিজেরা শেখো ও তোমাদের নারীদের শেখাও।'

(দারেমি, হাদিস : ৩৪৩০)

আনসারি নারীরা দ্বিনের গভীর জ্ঞানার্জনে অনেক আগ্রহ রাখতেন, তাই আয়েশা (রা.) তাদের প্রশংসা করে বলেন, 'আনসারি নারীরা কত ভালো! দ্বিনি জ্ঞানার্জনে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।'

(মুসলিম, হাদিস : ৩৩২)

মূলত ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নর-নারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেনি; বরং এটি সবার জন্যই অবধারিত করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর মর্যাদা ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি

কল্পে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে এমন সব পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যাতে তা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

কন্যাদের প্রতি পুত্রদের সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারো যদি একজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো ধরনের অবহেলা করেনি এবং পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর কোনো ধরনের প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

(আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৪৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নারীর মাতা-পিতাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে তিনটি কন্যাসন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদের শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া

করল, অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত অবধারিত করে দেবেন।

তখন জনৈক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, দুটি কন্যা প্রতিপালন করলেও? তিনি জবাবে বলেন, দুটি করলেও।'

(মিশকাত, হাদিস : ৪৯৭৫)

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (অর্থাৎ উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।'

(বুখারি : ৩৩৩১)।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এক হাদিসে। একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাদিস তো শুধু পুরুষরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন।'

তিনি বলেন, 'তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্র হবে।' সে মোতাবেক তারা একত্র হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দেন।

(বুখারি, হাদিস : ৭৩১০)

আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একবার আমি হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, 'তুমি কি ওকে (হাফসাকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে পিঁপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দেবে না?'

(আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৮৭)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীকেও শিক্ষাদানের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করেন। অথচ তাদের ব্যাপারে কেউ কোনো দিন চিন্তাও করত না। তিনি বলেন, 'কারো যদি ক্রীতদাসী থাকে, আর সে তাকে উত্তমরূপে বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয়। অতঃপর তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, তাহলে তার জন্য দুটি পুরস্কার আছে।'

(বুখারি, হাদিস : ৯৭)

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম নারীদের অন্তরে জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ইবনে সাদ তাঁর 'তাবাকাতে' ৭০০ নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বা তাঁর সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর 'আল-ইসাবাহ ফি তামায়িজিল হাদিস' নামক গ্রন্থে এক হাজার ৫৪৩ জন নারী হাদিসবিশারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) ছিলেন নারী শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহুসংখ্যক সাহাবি ও তাবেঈন তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন অনেক নারী চিকিৎসাসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধে আহতদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধেও গমন করেছিলেন। নুসাইবা বিনতে কাব আল-আনসারী (রা.) ছিলেন মদীনার একজন প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক। উম্মে আম্মারা নামে বেশি খ্যাত এই নারী সাহাবি।

রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামিয়া (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন মদিনার অন্য একজন নারী চিকিৎসক। তাঁকে 'ইসলামের প্রথম নার্স' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূলত তাঁর চিকিৎসক পিতা সাদ আল-আসলামির নিকট থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতই

ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে আহত সব সৈনিককে তার কাছে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতেন।

শিফা বিনতে হারেস ইসলামে সর্বপ্রথম পারিবারিক শিক্ষিকা ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান ও উম্মে শারিক ইসলামের প্রসিদ্ধ দাঈ ছিলেন। নারী তাবেঈনদের মধ্যে হাফসা বিনতে সিরিন ইবাদত, ফিকহ ও কোরআন-হাদিসের সুগভীর জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। (ইমাম শাফেয়িাদ, আয়াত : ১৭-১৮)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা :

শিক্ষা গ্রহণ সকল নরনারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। মসজিদে স্ত্রী পুরুষ একই সঙ্গে নামায পড়তেন। তখনও অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।[55]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি মহিলাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।[56]

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ« . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله واثنتين؟ قَالَ: «واثنتين«

“যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু'জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।[57]"

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।"[58]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোনো সময়ে যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তার কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।[59]

আল্-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধমে নব-নব সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।[60]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧ ﴾ [ال عمران: ٧]

“যারা জ্ঞানী ও বিদ্যান তারা বলেন, আমরা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং কেবল বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই (কোনো জিনিস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।”[61]

সুতরাং আল্-কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।[62]

মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন,

﴿وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤ ﴾ [الاحزاب: ٣٤]

“আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকতম পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।”[63]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্খা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعنهن الحياء ان يتفقهن في الدين

“আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।”[64]

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।”[65]

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في موخر النساء.

“জুম‘আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।”[66]

হারিসা ইবনু নু‘মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

«ما حفظت "ق" إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم»

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম‘আর খুতবাতে এটি পড়তেন।”[67]

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

«فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة

“তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।”[68]

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনhহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

“মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।"[69]

মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[70]

রেফারেন্স :

[55] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
[56] ড. মোঃ আজহার আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
[57] শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৩৪৫৭।
[58] আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, কিতাবুল ইলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।
[59] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *নারী,* (ঢাকা, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সংস্কার ১৯৮৮), পৃ. ৫০-৫১।
[60] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
[61] সূরা আলে ইমরান : ৭।
[62] ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু, *সংবিধান ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা,* ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৫৮।
[63] আল্-কুরআন, সূরা আহযাব : ৩৪।
[64] মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
[65] ইবন আবদি রাব্বিহি, *আল্-ইকদুল ফরীদ,* ১ম খণ্ড, কায়রোঃ মাতবাআতু লাজনাতিত্ তা'লীক, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৬।
[66] ইবন সা'দ, *আত্-তাবাকাত,* ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।
[67] .মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

[68] .বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, *মুসলিম নারীর পোষাক ও কর্ম,* ঢাকাঃ এশা রাহনুমা, সাইন্স ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮, পৃ. ৭২-৭৬।

[69] .বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[70] .বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন,

“আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।”[71]

ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

“আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ।[72]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[73]

মূসা ইবন্ তালহা বলেনঃ

‘‘আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।’’[74]

লোকেরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মূলায়কা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কন্যা। আর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখেছেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[75]

ফারায়েযের অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[76]

‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

‘‘আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।[77]

ইবন্ হিব্বান (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।"[78]"

রেফারেন্স :

[71] .দারেমী, সুনান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

[72] .হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ.২৭।

[73] জালালুদ্দীন উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

[74] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, আল্ ইসাবা ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

[75] হাকেম, মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[76] তদেব।

[77] .ইবনে ইমাদ হাম্বলী, শাজারাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ আল্-মাকতাবাতুত্ তিজারী, তা. বি. পৃ. ১১৪।

[78] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, তাহযীবুত্ তাহযীব, ১২শ খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি. পৃ. ১২৯।"

তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা :

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (র.) ইমাম যুহরীকে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, 'আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[79]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

“উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।”[80]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেনঃ
“তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।”[81]

আবূ রাফে‘ সায়িগ (র.) বলেনঃ
كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة .
“যখনই আমি ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।”[82]

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত দ্বীনের প্রচার ও ওয়াজ নসীহত করতেন।”[83]

উম্মূল মু’মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:
كانت عاقلة من عقلاء النساء
“তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী মহিলাদের একজন।”[84]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:
كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة
“উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন ফকীহ্ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।”[85]

“তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।”[86]
“তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।”[87]

ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উমর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,

كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.

“তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।”[88]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফিয ইবনে হাজার (র.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

“তাঁর মর্যাদা এবং গুণাবলী অনেক এবং সর্বজনবিদিত।”[89]

তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت من فاضلات الصحابيات.

“তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন।”[90]

উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন:

صلى الله عليه وسلم.

“তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।”[91]
হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বার বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ্ ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ما أدركت أحدا أفضِّلُ على حفصة.

“আমি এমন কোনো লোক দেখি নি, যাকে হাফসা বিনতে সিরীনের উপর মর্যাদা দিতে পারি।”[92]

তাবিয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন:

اجلس أعلمك علم سعيد.

“আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব।”[93]

ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন:

ارجع فالغلط معك.

“তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।”[94]

একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া‘কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ

“আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।”[95]

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা:

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হতো। মুসায়েব এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সালেহ জোতির্বিদ্যা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান লাভ করেন যে, একবার হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী সাবিনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এক উঁচু দরের সমালোচক ছিলেন যে, ফারাযদাকের মত কবিও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ানের কন্যা এবং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের

জ্ঞান প্রীতির কারণে তাঁদের বাড়িতে জ্ঞানী গুনী, কবি, সাহিত্যিক এবং ফকীহের আনাগোণা লেগেই থাকতো। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ এর স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদী মহিয়সী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদের মহিয়সী জুবায়দা প্রমুখ নারী রাজকার্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব খাটাতেন। হারুনের মহিয়সী জুবায়দা উচ্চ গুণ সম্পন্না কবি ছিলেন। মামুনের মহিয়সী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। আব্বাসীয় আমলে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব জননীদের উপর ন্যস্ত ছিল। মহিলাগণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন।[96]

রেফারেন্স :

[79] হাফিজ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

[80] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, *আল্-ইসাবা ফী তামীয্যি সাহাবা*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

[81] ইবনে আব্দিল বার, *আল্ ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব*, তাযকিরাত যায়নাব বিনতে আবূ সালামা, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৫।

[82] ইবনে সা'দ, আত্-তাবাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

[83] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, *আল্-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৩১৭।

[84] ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত*, ২য় খণ্ড, মিশরঃ ইদারাতুত্ তারআতিল মুনীরয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৩৪৯।

[85] বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

[86] ইবন আব্দিল বার, *আল ইসতিয়ার ফী আসমাইল আসহাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫৫।

[87] ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

[88] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

[89] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, ১২শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

[90] ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াস্ সিফাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

[91] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

[92] ইবনে হাজার আল্-আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।

[93] ইবনুল হাজ্জ, *আল্-মাদখাল*, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি., পৃ. ২১৫।

[94] তদেব।

[95] মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।
[96] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদান ও অধিকার

(১) হাদিস চর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান :

ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি‘য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন ‘আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি ‘আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে ‘আবিদা, ‘আবদা ইবন বিশর, উম্মে ‘উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, ‘আবদা বিনতে ‘আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।
এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম Authority হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি 'তাঁর সময়ের মুসনিদা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ

ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ্' গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।
এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা'রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান 'ওয়াফাত আল্-'আ'ইয়ান' এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার 'আল্-দুরার আল্-কামেনা' গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।' আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত "আদ-দ্বাউ উল-লামে' " গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার 'মু'জাম আল-শুয়ূখ' গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য।

যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে 'ইজাযত্' (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে 'ইজাযত' পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্রে ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিনতে কামাল আল্-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-দীনের স্ত্রী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ দামিস্কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। এলেপ্পোর ফাতিমা বিনতে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

ইতিহাস ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হবার চেষ্টা চালিয়েছেন।
ইবনে আল্-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৫৮৭/১২৮৮ সনে দামিস্কের উমর মসজিদে অনুষ্ঠিত ১১ বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে অনেক নারী উপস্থিত থাকতো।

অন্যদিকে দামিস্ক (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে আব্দুল্লাহ কর্তৃক।

রেফারেন্স :

Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins Development of Special Features, Cambridge : Islamic Texts Society 1993 'হাদীস চর্চায় মহিলা স্কলারদের অবদান' মাসিক আশ্-শাহদাহ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪২০ হি., মার্চ ২০০০ইং।।

(২) *অধিকার সংরক্ষণঃ*

ইসলামী সমাজের নারীদের যে সব অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে, রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সমাজে তা তারা পুরোপুরি ভোগ করেছে। কোথাও তাদের এ অধিকার খর্ব করলে কিংবা তাদের ওপর কোনরূপ অবিচার করা হলে তারা তার প্রতিকারের জন্য পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ইসলামী আইন বিধান সেসব ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সফল করার ব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা ও সহযোগিতা দিয়েছে।

একটি মেয়েকে তার পিতা আপন ধনাঢ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু কনে বরকে একেবারেই পছন্দ করে নি। মেয়েটি রাসূলে করীম (সা) এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ তুললে তিনি বললেনঃ

"এই বিবাহ রক্ষা করা না করা তোমার ইচ্ছাধীন"।

মেয়েটি বললঃ বাবার দেয়া বিবাহ আমি খতম করব না বটে; তবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েদের ইচ্ছা ও পছন্দের বিপরীত তাদের বিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তাদের পিতাদের নেই।

বুরাইরা নাম্নী এক ক্রীতদাসীর বিয়ে হয়েছিল মুগীস নামেক এক ক্রীতদাসের সাথে। কিছুদিন পর বুরাইরা দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করে। তখন সে মুগীসের স্ত্রীত্বাধীন থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। এই অস্বীকৃতি ছিল শরীয়তের শ্বাশত বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অস্বীকৃতির কথা জানতে পেরে মুগীস দুঃখ ও বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। সে বুরাইরার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং তাকে অনুরোধ করতে থাকে তার এই অস্বীকৃতি প্রত্যাহার করার জন্য।

রাসূলে করীম (সা) এই দৃশ্য দেখে সহানুভূতির ভারে বিষন্ন হয়ে উঠেন এবং বুরাইরাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। বুরাইরা বললঃ এটা কি আপনার আদেশ? জবাবে তিনি বললেনঃ না, আদেশ নয়। কেননা এ ব্যাপারে আদেশ করার কোন অধিকার আমার নেই। তবে আমি মুগীসের জন্য তোমার নিকট সুপারিশ করছি। নবীর সুপারিশ এবং নির্দেশে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য নেই জেনেও বুরাইরা বললঃ 'না, ওর কাছে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।'

বুরাইরার এই অনমনীয়তার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, ইসলামী শরীয়ত নারী সমাজকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার ভোগ করার জন্য আইনের আনুকুল্যও সে লাভ করবে। এই কারণে সে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল। শরীয়ত এ ব্যাপারে নির্বাক হয়ে গেল। –বুখারী, আবুদ দাউদ।

রাসূলে করীম (স) এর জীবনকালে মুসলিম মহিলারা মসজিদে হাজির হয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়তেন। অবশ্য হযরত উমর ফারূক (রা) নিজে মেয়েদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া পছন্দ করতেন না। তাঁর বেগম হযরত আতিকা (রা) ও নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। একদিন হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেনঃ 'তুমি জান যে, তোমার মসজিদে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি কেন বিরত থাকছ না?' জবাবে তিনি বললেন, "খোদার শপথ, আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি বিরত থাকব না।" বাস্তবিকই তিনি বিরত থাকেন নি। এমন কি, হযরত উমর (রা) মসজিদে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে যখন শহীদ হয়েছিলেন, তখনও তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। -বুখারী।

অন্যকথায়, স্বামী হিসেবে হযরত উমার (রা) নিজের স্ত্রীকে মসজিদে যাওয়া নিষেধ করতে পারতেন এবং সে নিষেধ তিনি মেনে নিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু শরীয়াত যেহেতু সাধারণভাবেই মহিলাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে, তাই সে অধিকার ভোগ করারও পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানও তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

(৩) সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা :

ইসলামী সমাজ গঠনে নারী সমাজের বিরাট অবদান রয়েছে। এ জন্যে তাঁরা বহু দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা বরণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। নিকটাত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্কও এ জন্যে ছিন্ন করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। এমন কি আপন ঘর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যেতে কিংবা বহিষ্কৃত হতেও কিছুমাত্র দুর্বলতা বা কাতরতা প্রদর্শন করেন নি। মোটকথা এ পথে যত বাধাই এসেছে, সবকিছু তাঁরা দুপায়ে দলে গেছেন।

মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব ভাগ্যবতী মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নির্যাতন ভোগ করার রক্তাক্ত কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। হযরত আম্মার (রা) এর জননী ছিলেন একজন ঈমানদার মহিলা। তিনি ছিলেন হযরত হুযাইফা ইবনে মুগিরার ক্রীতদাসী। দ্বীন ইসলাম থেকে তাঁকে বিরত রাখা ও কবুল করা দ্বীন ত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। নর পিশাচ আবু জেহেল বল্লমের আঘাতে আঘাতে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইসলামী ইতিহাসে এই ছিল প্রথম আত্মদান-প্রথম শাহাদাত বরণ।

(তাবাকাতে ইবনে সায়েদ)।

হযরত উমর (রা) এর বোন হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ঈমান গ্রহণের পর তাঁর আপন সহোদর ভাই উমর কর্তৃক এমনভাবে প্রহৃত হন যে, তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একবিন্দু বিচলিত হননি; বরং তিনি যে দ্বীন-যে কালামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, ভাইকে সে বিষয়ে অবহিত করে শেষ পর্যন্ত তাঁকেও ঈমান আনতে বাধ্য করেছিলেন।

আবূ সুফিয়ান ঈমান আনার পূর্বে মদীনায় রাসূলে করীম (সা) এর ঘরে উপস্থিত হয়ে রাসূলের সজ্জিত বিছানায় আসন গ্রহণ করতে গিয়ে তারই কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) কর্তৃক অপমানিত হয়েছিল। পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলঃ 'আমাকে কি এই শয্যার ওপর আসন গ্রহণেরও অনুপযুক্ত মনে কর?' কন্যা স্পষ্ট কথায় জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এটা আল্লাহর রাসূলের বিছানা। একজন মুশরিককে এর উপর বসতে দিয়ে এর পবিত্রতা নষ্ট হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

আবূ সাইফীর (রা) কন্যা রকীকা মক্কার সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশরা নবী করীম (স) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে তিনিই পূর্বাহ্নে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

উত্তরকালে এ ঈমানদার মহিলারা দ্বীনের ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করেন নি। আপন গর্ভজাতও যদি দ্বীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে কিংবা দ্বীনের একবিন্দু ক্ষতি সাধনে উদ্যোগী হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিও তাঁরা চরমভাবে কঠোর হয়েছেন এবং কোনরূপ খাতির করতে কিংবা দুর্বলতা দেখাতে প্রস্তুত হননি।

(৪) যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা :

প্রসঙ্গত একটি কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করে সামাজিক সামষ্টিক কাজের দায়িত্ব উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আর এই কর্ম বন্টনে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কোন দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে নারীদের ওপর অর্পণ করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার ব্যাপারে ঈমানদার নারী সমাজ কোনক্রমেই নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। আর এই কারণে তারাও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। কেননা কুফরীর ঝান্ডা অবনমিত ও পদদলিত করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ানোর কামনা বাসনা তাদের হৃদয় মনে জাগ্রত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই ইসলামের বিজয় ইতিহাসের সোনালী পৃষ্ঠায় পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও বিরাট কীর্তিকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উম্মে আম্মারা (রা) ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। ওহোদের যুদ্ধে যোগদান করে তিনি পুরুষদের মতই অতুলনীয় বীরত্ব, দুর্দমনীয় সাহসিকতা ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করে উঠে যেতেন এবং মুজাহিদদের খেদমত করার উদ্দেশ্যে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। এই যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সময়ে তিনি রাসূলে করীম (স) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তীর ও তরবারি চালাতে শুরু করে দিলেন। এই সময় শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর বল্লমের আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। স্বয়ং নবী করীম (সা)ও তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছেনঃ আমি ডানে ও বাঁয়ে তাকিয়ে দেখেছি উম্মে আমারা (রা) আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর পুত্রকে আহত করেছিল যে ব্যক্তি, তাকে সামনে পেয়ে তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করে করে তাকে হত্যা করে স্বীয় পুত্রের ওপর আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। একজন অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তাঁর ওপর আক্রমণ চালালে তিনি ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করেন এবং শত্রুসৈন্যটির ফিরে যাওয়ার সময় তার অশ্বের পা কেটে দিলেন। এই সময় তাঁর পুত্র মায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং মা ও পুত্র মিলে শত্রুকে সম্পূর্ণ নিধন করলেন। নবী করীম (সা) নিজে এই দৃশ্য অবলোকন করে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেনঃ "আজ উম্মে আম্মারা তুলনাহীন সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন।"

ওহোদ ছাড়াও খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাঁর হাতখানাই শহীদ হয়ে যায়। এছাড়া তাঁর সর্বাঙ্গে বহুসংখ্যক ক্ষতও দেখা দিয়েছিল। (তাবাকাতে ইবনে সায়াদ)।

রোমানদের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ হয়, তাতে হযরত ইকরাম ইবনে আবু জেহেল এর স্ত্রী হযরত উম্মে হুকাইম (রা)ও যোগ দিয়েছিলেন। আজনাদিন এর যুদ্ধে হযরত ইকরামা শহীদ হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পর হযরত খালীদ ইবনে সায়ীদের (রা) সাথে তাঁর পুর্নবিবাহ হয়। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই রোমানদের আক্রমণ শুরু হওয়ায় উম্মে হুকাইম (রা) প্রতিরক্ষা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শত্রুপক্ষের সাতটি সৈন্যকে খতম করতে সক্ষম হন। -আল ইস্তীয়াব।

ইয়ারমূক যুদ্ধে হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ নাম্নী মহিলা সাহাবীর হাতে নয়জন রোমান সৈন্য নিহত হয়। (আল ইসাবা)। হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করছিলেন, তখন উম্মে হারেস নাম্নী আনসার বংশের একজন মহিলা সাহাবী অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পর্বতের মত অবিচল থেকে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

হযরত আনাসের (রা) জননী উম্মে সুলাইম ওহোদ ও হুনাইনের যুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে যুদ্ধ করেন। রোমানদের সাথে জিহাদে হাবীব ইবনে সালমা অদৃষ্টপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ চলাকালে একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আগামীকাল আপনি কোথায় থাকবেন?' তিনি বললেন, 'হয় শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত, অথবা জান্নাতে ইনশা আল্লাহ।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আপনি যেখানেই থাকবেন, আমি আশা রাখি, আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। '

এভাবে ইসলামের দুশমনদের ব্যর্থ করার ব্যাপারে মুসলিম নারী সমাজ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বহুবার যোগদান করেছেন। বাতিল শক্তির বিনাশ সাধনে তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে এসেছেন। যেখানে তাঁরা নিজেদের হাতে অস্ত্রধারণ করেন নি, সেখানে পুরুষদের অস্ত্রধারণের জন্য সাহস ও হিম্মত যুগিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা জিহাদে আহত লোকদের সেবা শুশ্রুষা করেছেন। মুজাহিদরা যুদ্ধ করতে করতে পড়ে গেলে তাদের তুলে নেয়ার কাজ করেছেন; তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করে পৌছে দিতেন। তাঁরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লে মহিলারা তাঁদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে মহিলারা তাঁদের পানি পান করাতেন। নবী করীম (সা) এর নেতৃত্বে ছয়টি যুদ্ধে যোগদানকারী একজন মহিলা সাহাবী বলেছেন:

-'আমরা আহতদের জখমের ওপর ব্যান্ডেজ করতাম এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রুষা করতাম।'

উম্মে আতীয়া (রা) নাম্নী এক মহিলা সাহাবী রাসূলে করীম (সা) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেছেনঃ 'আমি মুজাহিদদের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের ও রোগাক্রান্তদের সেবাশুশ্রুষা করতাম।' - মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ।

ওহোদের যুদ্ধে বহুসংখ্যক সাহাবী আহত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের খেদমত ও সেবা শুশ্রুষার জন্য মদীনা হতে বহুসংখ্যক মহিলা সাহাবী ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। নবী দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা) ও এ ব্যাপারে কিছুমাত্র পশ্চাদপদ থাকেন নি। (ফতহুল বারী) হযরত আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রা)ও মুজাহিদদের খেদমতের কাজ করেছেন। তাঁরা এ কাজে এত তৎপরতা দেখিয়েছিলেন যে, তাঁদের দ্রুত চলাচলের ফলে তাঁদের দেহে পরিহিত অলঙ্কার পর্যন্ত দেখা যেত। তাঁরা পানির পাত্র পিঠের ওপর তুলে বহন করে আনতেন এবং মুজাহিদদের তা পান করাতেন। এ ধরনের কাজ তাঁরা বারবার করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ উম্মে সুলাইম (মহিলা সাহাবী) ওহোদের দিন আমাদের জন্য পাত্র ভরে ভরে পানি নিয়ে আসতেন। হুমনা বিনতে জাহাশ (রা)ও কাজ করেছেন সেদিন। তিনি তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছেন এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। এদের সঙ্গে শরীক ছিলেন উম্মে আয়মান নাম্মী অপর এক মহিলা সাহাবী। উম্মে আম্মারা নাম্নী মহিলা সাহাবী সকাল বেলাই আহতদের সেবা শুশ্রুষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য জরুরী জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ খায়বরের যুদ্ধে নবী করীম (স) এর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মহিলা সাহাবী যোগদান করেছিলেন। হাশর ইবনে যিয়াদের দাদী, আম্মা এবং আরও পাঁচজন মহিলাও এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা কি জন্যে এসেছেন জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বললেনঃ

-"হে রাসূল! আমরা এসেছি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, আমরা কবিতা পাঠ করব এবং এর সাহায্যে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রেরণা যুগিয়ে সাহায্য করব। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার ঔষধপত্র রয়েছে। তীর নিক্ষেপকারীদের হাতে আমরা তীর পরিবেশন করব এবং প্রয়োজন হলে ক্ষুধার্তদের ছাতু বানিয়ে খাওয়াব।"

সবচেয়ে বড় কথা, এই মহিলারা কোন বাহ্যিক চাপে পড়ে যুদ্ধে যোগদান করেন নি এবং এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তাঁরা কোনরূপ বৈষয়িক প্রলোভনে পড়েও করেন নি। বরং তাঁরা দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সাহচর্যকে নিজেদের জন্য বিশেষ সম্মানজনক ও পরকালে মহান কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সব কাজে অংশগ্রহণ করতেন। তাই খায়বর যুদ্ধে যাত্রাকালে গিফার গোত্রের কয়েকজন মহিলা উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ

-"হে রাসূল! আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি। আমরা সেখানে আহতদের ঔষধপত্র দিয়ে সেবা-শুশ্রুষা করব এবং মুজাহিদদের যতটা সম্ভব সাহায্য করব।

(৫) কর্মক্ষেত্রে নারী :

নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম এমন কথা বলে নি। বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যও ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে অংশগ্রহণ করারও তারা সম্পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প কারখানা স্থাপন, পরিচালন বা তাতে কাজ করারও অধিকার নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে অবশ্যই নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্তই জরুরী করে দেয়া হবে। বস্তুত অনুমতি এক কথা আর বাস্তবে তা চর্চা করা একান্তই জরুরী হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়। নারীদের মাঝেও এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণের আগ্রহ-উৎসাহ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করা ইসলামের রীতি নয়। সে উৎসাহ উদ্দীপনা নির্মুল করতে চেষ্টাও করেনি ইসলাম। বরং তার বাস্তব চরিতার্থতার অনুমতিটুকু দিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। তার অর্থ, একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে নারী এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে অকুণ্ঠ চিত্তে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। রাসূলে করীম (স) একবার জিহাদে গমনকারী লোকদেরকে সামুদ্রিক সফর করার বিরাট সওয়াব ও মর্যাদার কথা বললে উম্মে হারাম নাম্নী এক মহিলা সাহাবী বললেনঃ 'হে রাসূল! দোয়া করুন, আমিও যেন এই জিহাদে শরীক হতে পারি।' রাসূলে করীম (সা) ও তাই করলেন। অথচ এটা জানা কথা যে, জিহাদে গমন নারীদের জন্য ফরজ করা হয় নি। এ থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেজাজ প্রকৃতি স্পষ্টত ফুটে ওঠে। সামাজিক সামষ্টিক কাজ হতে নারীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকুক কিংবা তার প্রতি তাদের কোন কৌতুহল ও আগ্রহ উৎসাহ থাকবে না, তা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়। তাদের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই তাদেরকে চিরজীবন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, তার বাইরে তারা উঁকি মেরেও তাকাবে না, ইসলামে তাও কোন পছন্দনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু সামাজিক-সামষ্টিক কাজকর্মে কর্মীদের যেসব মৌলিক গুণ ও যোগ্যতা ক্ষমতা স্বভাবতই থাকা

দরকার, নারীদের তা খুব কমই থাকে বলে স্বভাবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম নারীদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় নি। এই পর্যায়ের গুণ বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরোধী শক্তির সাথে নিরন্তর দ্বন্ধ ও সংগ্রামে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে। কিন্তু নারীদের পক্ষে নিজেদের স্বাভাবিক দায়-দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্ধ-সংগ্রামে লিপ্ত সুযোগ খুব বেশি হওয়া কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয়। এই কারণে তাদের পক্ষে সামাজিক সামষ্টিক কার্যাবলীতে কার্যত অংশগ্রহণ পছন্দ করা হয় নি। পছন্দ করা হয়নি এ কারণেও যে, নারীরা যদি তাই করতে যায়, তাহলে পারিবারিক দায়িত্ব, সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব ও শিশু লালন-পালন তথা মত মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে একান্তই জরুরী কার্যাবলী সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে; তা থাকবে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অবহেলিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সব সুখ শান্তি, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতাও নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন হবে এতে। এই কারণে নারীদেরকে কঠিন অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে শান্তিপূর্ণ ঘর সংসার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন করে দেয়াকে ইসলাম সমর্থন করে নি। তাই বলছিলাম, বাইরের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ করতে নারীদের নিষেধ করা না হলেও –বরং তার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও – সাধারণভাবে তাদের জন্যে তা পছন্দ করা হয় নি। তবে তার অর্থ এ-ও নয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে কখনই যাবে না, এবং বাইরের দরকারী কাজও তারা করবে না।

একজন মহিলা সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনকালে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর গাছের ডাল কেটে বিক্রী করার অনুমতি চাইলে রাসূলে করীম (স) জবাবে বললেনঃ আরবী (***)

-ক্ষেতে যাও, অতঃপর নিজের খেজুর গাছ কাট (আর বিক্রী কর)। এই টাকা দ্বারা সম্ভবত তুমি দান খয়রাত অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে। (আর এভাবে তা তোমার পরকালীন কল্যাণ লাভেরও নিমিত্ত হবে।)

একথা বলে নবী করীম(স) হযরত জাবির (রা) এর খালাম্মাকে মানবতার কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। এর তাৎপর্য ইসলামী শরীয়তে নারী সমাজকেও মানবতার খেদমত ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন কখনই সীমা লংঘিত না হয়, সেদিকে ইসলামের সতর্কতা কারুরই অজানা নয়।

(৬)আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা:

একটি সন্তান মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের যে সুশিক্ষা পেয়ে থাকে সেটাই তার জীবনে আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মূল ভিত্তি হয়ে থাকে। আর একজন মা তার সন্তানকে তখন'ই প্রাথমিক পর্যায়ের সুশিক্ষা ও আদব—কায়দা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় যখন

দ্বীন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানগুলো যথা— সন্তান লালন—পালন, নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানগুলো তার জানা থাকে। একজন নারী দ্বীনের আহকামগুলো না জানার কারণে নিজে যেভাবে দুনিয়া—আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তেমনিভাবে তার অভিভাবক ও অধীনস্তরাও তার কারনে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও আখেরাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে একজন আদর্শ নারীর কারণে যেমনিভাবে তার অভিভাবকরা হয় দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত, তেমনিভাবে তার অধীনস্থরাও হয়ে থাকে উন্নত আদর্শে আদর্শিত।

কেননা একটি আদর্শ জাতি গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ মানুষের বিকল্প নেই, আর আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই। আল্লামা নুরুল ইসলাম আদীব সাহেব(দা.বা.) এক বয়ানে বলেন— একটি সন্তানের দৈহিক গঠনের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় তার মায়ের দেহের নির্যাস মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা। বাবার ওরশ থেকে যখন সন্তান মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়, সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মায়ের দেহের রক্তের মাধ্যমে সন্তানের দেহ গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনিভাবে সন্তান পৃথিবীতে আসার পর অন্ততপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত যে দুধ পান করে থাকে সেটাও মায়ের দেহ নিঃসৃত। তথা এই সন্তানের দেহের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় মায়ের শরীরের অংশ দ্বারা। সুতরাং বাচ্চার দেহ গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু মায়ের দেহ মিশ্রিত পদার্থের প্রভাব বেশি। তাই মায়ের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি বাচ্চার উপর স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি'ই প্রভাব বিস্তার করবে। আর এটাই স্বাভাবিক।

দ্বীন শিক্ষা না করার ক্ষতি:

বর্তমান সময়ে অধকিাংশ অভিভাবকই শংকিত তার সন্তানকে নিয়ে। কেননা সুশিক্ষার অভাবে আজ ছেলে বাবার কথা শুনছে না, মেয়ে মায়ের কথা মানছে না। পশ্চিমা ভাবধারায় চলতে গিয়ে তারা আজ নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে শৃংখলহীন এমন এক জীবনের দিকে, যেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, মানুষের বংশপরিচয় বিলুপ্তির পথে, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলছে, যিনা—ব্যভিচারের ফলে ব্যাপক হারে বাড়ছে নতুন নতুন রোগ—ব্যাধি, লজ্জা—শরমের মতো চারিত্রিক মহাসম্পদ সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে।অবশেষে বয়স বাড়ার পর মহিলাদের জীবন নিজের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিমা সভ্যতা, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং সুখী মানুষ বলে মনে করি, যেখানে যেতে পারা, বসবাস করতে পারা অথবা সেখানে যেতে না পারলেও অন্তত পক্ষে নিজের দেশে থেকে তাদের সাংস্কৃতি অনুযায়ী চলতে পারাকে আমরা অনেকেই নিজেদের জাগতিক সফলতার চাবিকাঠি মনে করে থাকি। অথচ তাদের জীবনের সচরাচর বাস্তব অবস্থা হলো এমন, যা আমি সংক্ষিপ্তাকারে উপরে উল্লেখ করেছি।

অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া লোকগুলোর জীবন আচার, চলাফেরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার ফলে একটা গরীব থেকে গরিব লোকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণ ভরে, কোরআন—হাদিসের পড়শে তার জাগতিক জীবনে সে অনুভব করে এক অনাবিল প্রশান্তি। আর এটা, যে যতটুকু কোরআন—হাদিস অনুযায়ী চলে, যে দ্বীনের ছায়াতলে যতটুকু আশ্রয় নেয় এবং যে যতটুকু কোরআন—হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে ততটুকু অনুভব করতে পারে।

সুতরাং একটা পরিবারকে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য, সেই পরিবারকে ইসলামিক পরিবার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নারীর কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে কোন নারী যদি নৈতিকতাহীনভাবে সমাজে চলাফেরা করে, তাহলে তার একজনের ক্ষতি আরও দশটা নীতিহীন পুরুষের ক্ষতির চেয়েও অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ফিতনামুক্ত দ্বীনি পরিবেশের সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই ।

কেননা যে পথে বিপর্যয় আসে সে পথেই তা রোধ করতে হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সেদিকে আমরা তেমন একটা মনোযোগ দেইনি। ইসলামের শুরু যুগে শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে নারীসমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, সাহিত্য ও ইসলামের প্রচার—প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত তারা। অথচ বর্তমানে আমাদের মানসিকতা এমন হয়েছে যে, কেবল রান্না—বান্না করা, স্বামীর খেদমত করা ও সন্তানের

লালন—পালন করা, অনেকে আবার আধুনিকতা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে অফিস—আদালত, রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পাড়াকে'ই মহিলাদের কাজ মনে করে থাকে।

অবশ্য মহিলারা যদি উপরোক্ত কাজসমূহ শরয়ী বিধান অনুসারে করে থাকে, তাহলে অবস্থাভেদে এগুলোও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু শরয়ী বিধান অনুসারে কোন কাজ করতে হলে তো তাকে আগে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অথচ সেদিকে আমাদের কোন গুরুত্ব'ই নেই।

শুধু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা :

আমাদের মুসলিম মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা জ্ঞানী-গুণী মা বোনেরা তথাকথিত প্রগতিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দূর্নিবার আকর্ষণে মোহাবিষ্ট হয়ে শাশ্বত সুন্দর জীবনাদর্শ ইসলামী আইনকে কুসংস্কার ও ইসলামের নির্দেশিত পর্দাকে অবরোধ বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরে থাকছেন। তারা বুঝতেন না যে, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই এবং এ জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজকে নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা সাধারণভাবে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। মানব রচিত মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হয়ে কি পেয়েছেন তারা?

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন মানুষ ইসলাম অনুসারী। অতীতের বিবেচনায় বিদ্যানিকেতনগুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শতকরা হারে শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মেয়েদের জন্য অনেক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এটা একটা আশাব্যঞ্জক নিদর্শন, সন্দেহ নাই। এই নিদর্শনের পবিত্রতা রক্ষিত হলে ইসলাম একে স্বাগত জানাবে। তবে পবিত্রতা রক্ষার অপারগতার পরিচয় দিলে ইসলাম একে কোনো দিনই অনুমোদন দিবে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা মাঝে মাঝে এমন কিছু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি যা ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না। ছেলেমেয়েদের শালীনতা বর্জিত মেলামেশা এমন একটি পর্যায়ে ঠেকেছে যে, শুধু ইসলাম কেন, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো ধর্মই একে অনুমোদন দিবে না। আমরা আশা করি, আমাদের নিরক্ষর জনসমুদ্র দ্রুত নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। তবে ইসলামী অনুশাসন যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার বান নিক্ষেপ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমাদেরকে সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। ইসলামের সাম্য নীতি যাতে কোনো

অশালীন প্রক্রিয়ার মাঝে বিলীন হয়ে না যায়, তার ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এ সত্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। শরীয়তের অনুমোদিত উপায়ে 'জেন্ডার বৈষম্য' মুক্ত হয়ে মানব সম্পদের এই বৃহৎ অংশ নারী জাতির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রয়াস ইসলাম গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও তৎপরতাকে ইসলাম কল্যাণকর মনে করেছে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন ইসলামের একান্ত কাম্য।

যুগের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে এবং তাদেরকে ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে সারা দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়, নারী মাদ্রাসা ও নারীদের জন্য সতন্ত্র সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন, যেগুলো নারীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

নারী শিক্ষায় চ্যালেঞ্জসমুহ:

- **সহ –শিক্ষা:**

কোনো যুবক-যুবতী যুগলকে যদি অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বলা হয়, তোমরা কেউ কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না- তাহলে এ উপদেশও কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না। সহশিক্ষার কুফল কি হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে যে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও মানুষ এ থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, মানব রচিত আইনে এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আছে শুধু সমস্যা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায়। সহশিক্ষা ব্যবস্থা মানব জাতির যে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদূর্ভাব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

সহশিক্ষার কুফল হলো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সাথে অবাধে কথা বলার এবং যথেচ্ছা মেলামেশার করা সুযোগ পায়। এ

অভ্যাসের কারণে সহপাঠী ও সহপাঠিনী ছাড়াও বাইরের ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা চলে। এদের মধ্যে যার সাথে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সাথে বিয়ে না হলে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি। কেউ কাউকে বরদাশত্ করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশি। এভাবেই সৃষ্টি হয় গরমিল আর পরিণামে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা- তালাক।

সহশিক্ষার বদৌলতে মেলামেশার কারণে একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি।

অতএব, গোটা জাতিকে আল্লাহর গযব, অপূরণীয় ক্ষতি, ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জাতীয় কর্তব্য।

রেফারেন্স :

মোসাম্মত কবিতা সুলতানা, *ধন্য আমি নারী,* ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫-৮০।

- **নারীর সুরক্ষা:**

নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়।

- **জাগতিক বৈষম্য:**

জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীদের প্রতি বৈষম্য দেখা যায়, যা নারী শিক্ষার পথে একটি চ্যালেঞ্জ।

- **ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকা:**

প্রচলিত লিঙ্গ ভূমিকা এবং গতানুগতিক ধারণাগুলো নারী ক্ষমতায়ন ও শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

- **ঐতিহাসিকভাবে সুযোগ সীমিত:** মধ্যযুগের পর থেকে অনেক মুসলিম সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে, যা তাদের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।
- **সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা:** আধুনিক যুগে কিছু সামাজিক রীতিনীতি ও ভুল ধর্মীয় ব্যাখ্যার কারণে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত হচ্ছে, যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী।
- **আধুনিক যুগে চ্যালেঞ্জ:** অনেক দেশে নারী শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষার সুযোগ এখনও সীমিত, যা মুসলিম সমাজের অগ্রগতিতে একটি বড় বাধা।
- **অ্যাক্সেসের অভাব:** অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, দূরবর্তী অবস্থান, বা সুরক্ষার অভাবের কারণে অনেক নারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।
- **অপর্যাপ্ত সুযোগ:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণেও অনেক নারী শিক্ষার পথ থেকে ছিটকে পড়েন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পদক্ষেপ :

- **ইসলামী শরীয়ত-সম্মত পদ্ধতি:**

আধুনিক যুগেIslamic শরীয়ত সম্মত পন্থায় নারী শিক্ষাকে বৈধতা দেওয়া এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

- **জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান:**

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে লিঙ্গ সমতা প্রচার করে এবং নারীদের তাদের অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করা জরুরি।

দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পন্থা ও করণীয়:

নারীর উপর দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার এই ফরয আদায় করার বিভিন্ন পন্থার সাথে সাথে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য মহিলা মাদরাসায় অধ্যয়ন করাও সহজ একটা মাধ্যম। কেননা যদিও আমাদের পূর্বসূরীদের পন্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মেয়েদেরকে ঘরেই তালিম দান করত এবং নিজেরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বর্তমান বাবা—মায়েদের জন্য সেই ফুরসত হয়ে ওঠেনা, তাছাড়া বর্তমান বাবা—মায়েদেরও ঐরকম দ্বীনি জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেরাই থাকে দিকভ্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর চলার জন্য যে ইলম অর্জন করা জরুরি, তার জন্য বর্তমানে মহিলা মাদরাসাগুলোর ভূমিকা অপরসীম।

বর্তমানে এই মাদরাসাগুলো নারীদের দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা দেশে এর শাখা—প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মেয়েরা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু বর্তমানে নারী জনসংখ্যার তুলনায় মাদরাসায় পড়–য়া নারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরদিকে বিশাল এক সংখ্যা রয়ে যাচ্ছে যারা স্কুল, কলেজ—ভার্সিটিসহ বিভিন্ন ধরণের সহশিক্ষা ও সহাবস্থানের পরিবেশে পড়াশোনা বা অবস্থান করছে। তারা যদিও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও দুনিয়াবি উন্নতি অর্জন করছে, কিন্তু দ্বীনি বিষয়ে এতটা অনবগত যে, দেখে দেখে কোরআন পড়তেও অক্ষম এবং নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়িলগুলো সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবগত। এমন নারীদের জন্যেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যান্ত জরুরি। চাই তা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক বা তাদের অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, অথবা কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বয়সের, প্রতিটি নারী—পুরুষের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে আশার বাণী হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও, সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ বা বাসা কেন্দ্রিক নারী—পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এটা আরো ব্যাপক ও সুশৃংখলতার সহিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্কুলগুলোতেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যতদিন পর্যন্ত খেলাফত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত অন্তত দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী ইলম বিস্তার করার ক্ষেত্রে সামাজিক বা ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগের বিকল্প নেই।

উপসংহার:

ইসলাম নারী শিক্ষাকে সমর্থন করে এবং এটিকে একটি অপরিহার্য অধিকার হিসেবে দেখে। তবে, কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নারী শিক্ষার পথে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে এবং ইসলামী শিক্ষা ও সমসাময়িক প্রয়োজন অনুসারে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি উন্নত ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব।